Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 66–73
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

'পুতুল নাচের ইতিকথা': জীবনের রঙ্গমঞ্চ

সঞ্জিত সরকার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ
ই-মেইল: sanjitsarkar342@gmail.com

Keyword
রঙ্গমঞ্চ, পরাধীন, নিয়তি, নিয়ন্ত্রন, পুতুল, পরিবর্তন, অভিযোজন, পরিণতি

Abstract
জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই নিয়তি যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যেন নিতান্ত পুতুলের মত। পুতুলনাচে পুতুলেরা যেমন তাদের নিয়ন্ত্রক বা মালিক দ্বারা সর্বদা চালিত হয়, ঠিক তেমনই কোন অদৃশ্য শক্তির বন্ধন দ্বারা নিয়তি আমাদের যেন সর্বদা সেভাবেই পরিচালিত করে। এই কথাটিই ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন। হারু ঘোষের অপঘাতে হঠাৎ মৃত্যু, ডাক্তার হিসাবে শশীর গাওদিয়া গ্রামে থেকে যাওয়া, শশি ও কুসুমের অপরিণত প্রেম, যাদবের মৃত্যু ও গোপালের গৃহত্যাগ করে কাশী যাত্রা প্রভৃতির মত ঘটনা জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঘটতে দেখা যায়, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে হয়।'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে আক্ষরিক অর্থে কোথাও পুতুলনাচের বর্ণনা নেই। পুতুল বলতে ঔপন্যাসিক সাধারণ মানুষ অর্থাৎ আমরাই যে পুতুল তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। জীবনের কোন কোন পর্যায়ে এসে অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে পট পরিবর্তন হতে দেখা যায়। যেমন কুসুম শশীকে প্রথম দিকে কামনা করলেও শেষে কিন্তু শশীর সঙ্গে যেতে সে অস্বীকার করে। গোপাল সারা জীবন সংসারে থেকে শেষে কাশী যেতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে মতি যে গ্রামে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠে তা ছেড়ে ছন্নছাড়া জীবনকে বরণ করে নেওয়া এবং বনবিহারীর প্রতিভা সম্পর্কে পরবর্তীতে জয়ার সন্দেহ প্রকাশ এই বিষয়গুলি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ যেন নিয়তির এক অনিবার্য পরিণতি।

Discussion
আমরা আমাদের জীবনকে যদি একটি রঙ্গমঞ্চের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব আমরা প্রত্যেকেই এই রঙ্গমঞ্চে অবিরাম অভিনয় করে চলেছি। আমরা সবাই যেন এই রঙ্গমঞ্চের পাত্র-পাত্রী। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সাবলীল করে তুলতে চায় কিন্তু বাস্তবে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ আমাদের সকলকে নিয়তি নামক নিয়ন্ত্রক প্রতিনিয়ত আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। পুতুলনাচের যেমন পুতুলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মালিক কিছু সূক্ষ্ম সুতোর সাহায্যে, অনুরূপ ভাবে অদৃশ্য কোন বন্ধনের সাহায্যে আমাদের সমস্ত শরীর যেন নিয়তির হাতে বাঁধা পড়ে আছে। তাই সর্বদা আমরা নিয়তির দ্বারা আমরা পরিচালিত হচ্ছি। আমরা প্রত্যেকে

একটি সুন্দর সরল মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সময় এবং পরিস্থিতি আমাদের সেই সরল মনটিকে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিতে আমাদের এই কথাগুলি যেন ঔপন্যাসিক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে বাস করেও আমাদের মন ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে, ফলে আমাদের জীবনতরী ক্রমশ সমস্যায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

গাওদিয়া গ্রামটিকে একটি রঙ্গমঞ্চ ধরলে গোপাল, শশী, কুসুম, মতি, কুমুদ, যাদব প্রভৃতিকে সেই রঙ্গমঞ্চের পুতুল বা পাত্র-পাত্রী ধরা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক শুরুতেই বজ্রপাতে হারু ঘোষের মৃত্যু দিয়ে আমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিলেন যে আমরা প্রত্যেকেই যেন নিয়তির দ্বারা পরিচালিত।সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

> *"নিয়তির মতন দুর্বোধ্য প্রবল পরাক্রান্ত প্রকৃতির পেক্ষাপটেই তাঁর উপন্যাসের মানুষদের স্পন্দিত জীবন বর্ণনা করেছেন তিনি।অনিবার্য মৃত্যুর আগে কয়েক মুহূর্তের বিদ্যুৎ আলো--এটাই জীবন।"* [১]

কাহিনীর ক্রমশ অগ্রগতির সঙ্গে আমরা দেখতে পাই গাওদিয়া গ্রামের একমাত্র ডাক্তার শশী। সে নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের মানুষদের সেবা করতে চায়।মানুষের মধ্যে কল্পনা ভাব যেমন থাকে তেমনি থাকে বাস্তববাদী ও বিষয়বুদ্ধি বোধ।শশীর মধ্যে এই দুই দিকের উপস্থিতি স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা গেছে।শশীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন-

> *"শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট।তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মুক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহার সঙ্গে না মিশলে একথা কেউ টের পাবে না যে, তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও স্ত্রী হীনতার একটা গভীর সহানুভূতি মূলক বিচার - পদ্ধতি আছে।তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবী প্রকৃতির পরিচয় মানুষ সাধারণত পায়।সংসারে টিকিবার জন্য দরকারি এই পণ্যগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে।"* [২]

'পুতুল নাচের ইতিকথা' আসলে সাধারণ মানুষের জীবনের জটিলতা অন্বেষণের উপন্যাস। শশী সারা জীবনব্যাপী সেই জটিলতা অন্বেষণ করেছে।হারুর মৃতদেহ সৎকারের মধ্য দিয়ে আমরা তাকে সমাজসংস্কারক হিসেবে দেখি।গ্রামে থাকা ও গ্রাম ত্যাগ করা নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং কুসুমের সঙ্গে তার প্রেম সব মিলিয়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে।সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শশীর জীবনের সার্থকতা আমরা দেখতে পাই। তার পিতা গোপাল দাসের সঙ্গে তার নিরন্তর লড়তে হয়েছে।তবে তাকে সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হয়েছে মনের দোলাচল্ চিত্ততার সঙ্গে। জীবনকে সে এই ভাবেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে গেছে।সমালোচকের মতে—

> *"শশী ত্রিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রতিভূ।শশীর জীবনে এবং মনে গাওদিয়ার জটিল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই গাওদিয়া রূপময় হয়ে ওঠে।"* [৩]

শশীর বাবা গোপালকে আমরা সংসারী বুদ্ধি সম্পন্ন গৃহস্থ মানুষ হিসেবে দেখতে পায়। যিনি সবসময় অর্থ ও ধনসম্পদের প্রতি আসক্ত ছিলেন।তাইতো যাদবের দান করা যথাসর্বস্বের ভার গোপাল নিজে নিতে চেয়েছিল, যাতে সেখান থেকে কিছু ভাগ নিতে পারে।লেখকের কথায়-

> *"গোপাল বলিল, ব্যস্ত কি হই সাধে? তুই ছেলে মানুষ, কি করতে কি করে বসবি—*
> *আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই করব।*
> *একজন সৎ কাজে যথাসর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছে, আর একজন তাতে কিছু ভাগ বসাইতে চায়। কিছু ভালো লাগে না শশীর। অসংখ্য দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে।"* [৪]

হাসপাতালের কাজ নিয়ে গোপাল ও শশীর মধ্যে বেশ কিছুটা টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়।নিঃস্বার্থ ও স্বার্থপরতার দ্বন্দ্ব আমাদের চোখে পড়ে।গোপাল চেয়েছিল তার পুত্র শশীকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে কিন্তু গোপালের অনেক চেষ্টাতেও অর্থের প্রতি প্রলোভন শশীর ভিতরে কোনদিনই জন্ম নেয়নি।যদিও সাংসারিক গুণগুলি শশীর মধ্যে গোপাল বেশ কিছুটা সঞ্চালন করতে পেরেছিল।

শশী ও গোপালের মনোমালিন্য দেখা যায় সেন দিদিকে নিয়ে।সেনদিদির ছেলে অসুস্থ হওয়ায় গোপাল উদ্বিগ্ন হয়, নিজে শশীর কাছে গিয়ে শিশুটিকে দেখতে যাবার জন্য অনুরোধ করে-

> *"শশী মুখ তুলিল না, কথা বলিল না। গোপাল বাঁ হাত বাড়াইয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, জ্বর হয়েছে নাকি? দেখি। দ্যাখ তো শশী একবার গায়ে হাত দিয়ে? জ্বরই মনে হচ্ছে যেন।*
> *শশী নিঃশব্দে ভাত ফেলিয়া চলিয়া গেল।*
> *জ্বর হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য অতটুকু শিশুর গায়ে একবার হাত দিবার অনুরোধ।তার জবাবে অমন করিয়া উঠিয়া গেলে সে কাজের মানে গোপালের মাথাতেও ঢোকে বইকি। কুন্দর বিস্মিত দৃষ্টিপাত লজ্জায় গোপালের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম।"* [৫]

সেনদিদির ছেলেকে মানুষ করার জন্য কুঞ্জকে সোনার হার কিনতে দুশো টাকা দেয় গোপাল ইত্যাদি ঘটনায় যাদবের স্ত্রী সেনদিদির সঙ্গে গোপালের অবৈধ সম্পর্কের কথা অনুমান করতে পারে শশী। ফলে গোপাল সম্পর্কে কুরুচিকর মনোভাব জন্ম নেয় শশীর মধ্যে।

গোপাল নিজের পুত্রের কাছে সেভাবে সম্মান পায় না। উপন্যাসটির শেষে আমরা দেখতে পাই সংসারী বুদ্ধিসম্পন্ন গোপাল অবশেষে পরিস্থিতি চাপে পড়ে কাশীতে আশ্রয় নেয়। নিয়তির স্পষ্ট বিধান এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কোনদিন কাশিতে কি যাবে বা সেখানে সারা জীবন অতিবাহিত করবে একথা গোপাল ভাবতে পারেনি। কিন্তু দেখা যায় নিয়তির পরিণতি তাকে কাশিতে যেতে বাধ্য করেছে।

নিয়তি মানুষের নিয়ন্ত্রক, ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথাটি যেন বারে বারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'- র মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশীর মনের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল কুসুম। পরানের স্ত্রী কুসুমকে ঘিরে শশীর গোপন ও অস্ফুট প্রেম এক বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শশীর গাওদিয়া থাকার একটি গভীর আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় কুসুম। কখনো মাজা ভাঙার ভান করে শশীর কাছে ওষুধ আনতে আসে; আবার কখনো দেখা যায় শশীর প্রতি কুসুম অভিমান করে; এই অভিমান যেন ভালোবাসারই একটি প্রতিরূপ মাত্র। শশীও যেন কুসুমের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণ- বিকর্ষণের মাঝেই চলতে থাকে শশি ও কুসুমের নিবিড় প্রেম।একদিকে সমাজের বন্ধন অন্যদিকে মানসিক চাওয়া-পাওয়া, এই দুটোর মাঝে পড়ে শশী ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। মানুষ যা চাই তা সহজে পায় না এটাই নিয়তি শেষ কথা।লেখকের কথায়-

> *"...সংসারের মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা। একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।"* [৬]

এই কথায় যেন উপন্যাসটির সারমর্ম।শশী মাঝে মাঝে কুসুমের চরিত্রটি বুঝে উঠতে অক্ষম হয়। কখনো সে দেখে কুসুম তার স্বপক্ষে আবার কখনো দেখে তার বিপক্ষে। অর্থাৎ নারী চরিত্রটিকে বুঝে ওঠা শশীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। শশী মনে মনে ভাবে নারী চরিত্র হল বিধাতার সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি।

কুসুমকে কেন্দ্র করেই শশী যেন গাওদিয়া গ্রামে এক বন্ধন অনুভব করে। তাই সে গ্রামের মায়া ত্যাগ করে যেতে পারে না।

> *"এ কী আশ্চর্য যে কুসুমকে সে বুঝতে পারে না, মৃদু স্নেহসিঞ্চিত অবজ্ঞা সাত বছর যার পাগলামিকে সে প্রশ্রয় দিয়েছিল, শশীর একটা দুর্বোধ্য কষ্ট হয়। যা ছিল শুধু জীবনসীমায় বহিঃপ্রাচীর, হঠাৎ তার মধ্যে একটা চোরা দরজার আবিষ্কৃত হয়েছে, ওপাশে কত বিস্তৃত, কত সম্ভাবন্ কত বিস্ময়।কেন চোখ ছল ছল করিল না কুসুমের একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার নামে আছাড় খাইয়া তাহার কোমর ভাঙিয়াছিল, যদি বা শেষ পর্যন্ত গেল, ফিরিয়া আসিল পনেরো দিনের মধ্যে।"* [৭]

পল্লীবধূ কুসুমের মনের নাগাল পাওয়া যেন শশীর কাছে অনেক শক্ত হয়ে উঠেছে। কখনো কুসুমকে তার অনেক সহজ সরল বলে মনে হয়েছে আবার কখনো দুর্বোধ্য।উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশীর সম্পূর্ণ মন জুড়ে আছে কুসুম।কুসুম কখনো অসুখের ভান করে; কখনো ক্ষমা চাওয়ার অজুহাতে শশীর কাছে আসে তার ভালোবাসার কথা জানাতে কিন্তু শশী কুসুমের এই মনোভাব ঠিক মত বুঝে উঠতে পারেনা। তাই কুসুম তার ভালোবাসার কথা জানাতে পারে না।অন্যদিকে গাওদিয়া ছেড়ে শশী কলকাতায় এক মাস থাকার জন্য আসলে সেখানেও সে বেশিদিন থাকতে পারে না।কারণ কি শুধুই গাওদিয়া মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা? নাকি, কুসুমের প্রতি টান।শশী ও কুসুম পরস্পরের প্রতি টান

অনুভব করলেও তারা মনের কথা একে অন্যকে স্পষ্ট জানাত ব্যর্থ হয়।কিন্তু শেষে যখন শশী কুসুমকে তালবনে ডেকে তার ভালোবাসার কথা বলে, তখন দেখা যায় কুসুরের মনের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।ঔপন্যাসিকের কথায়-

> *"কুসুম ম্লান মুখে বলিল, আপনাকে কি বলব ছোটবাবু, আপনি এত বোঝেন। লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্য কোন সুখ চাইনা--বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি--আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কী। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"* [৮]

শেষে আমরা দেখি গভীর ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও কুসুম ও শশীর প্রেম পরিণতি পায়নি। দুটি মনের কামনা-বাসনা অতৃপ্তই রয়ে গেছে। আমরা যাই করি না কেন আমাদের সমস্ত কর্মই নিয়তির হাতে যেন আবদ্ধ তা আরো একবার ঔপন্যাসিক প্রমাণ করেন।

পুতুল নাচের পুতুলের মতো আমরা যেন পরাধীন কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের প্রতিনিয়ত পরিচালনা করে। আমরা যেমন যতই শক্তিশালী হই না কেন প্রকৃতির থেকে কখনো বেশি শক্তিশালী আমরা হতে পারিনা। ঠিক তেমনি আমরা যতই আমাদের নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি না কেন নিয়তির নিয়ন্ত্রণে আমরা যেন বাঁধা পড়ে আছি। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো যামিনী কবিরাজ। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কবিরাজ। অনেক দূরের গ্রামে তাকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। তার ওষুধ মানুষের জীবনকে ধরে রাখে বলে দাবি করেন তিনি—

> *"সিদ্ধির পাতা মিশাল দিয়া যামিনী যে চবনপ্রাশ প্রস্তুত করে তাহা নিয়মিত সেবন করলে বৃদ্ধের দেহে যুবার শক্তির সঞ্চার হয়। মরিয়া গেলেও যামিনীর মকরধ্বজ রোগীর দেহে জীবন আনিয়া দিতে পারে।তারপর এই জীবনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য জামিনীরই আদি ও অকৃত্রিম আবিষ্কার মহাকপিলাদি বটিকা সেবন করা বিধেয়।"* [৯]

যামিনী কবিরাজ মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে এমন দাবি করলেও নিজের মৃত্যুকে সে কোনভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেনি। রথের দিন মৃত্যু এসে তাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেছে ।যদিও ঔপন্যাসিক যামিনী কবিরাজের ইচ্ছামৃত্যু দেখিয়েছেন, তবুও তিনি চাইলেও নিজের মৃত্যুকে কখনো নিয়তির থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতেন না।জীবনের রঙ্গমঞ্চে যামিনী কবিরাজ একজন কবিরাজের ভূমিকা পালন করলেও তার মৃত্যুর দিনে কবিরাজি কোনো কাজে আসেনি।অনুরূপভাবে যামিনী কবিরাজের স্ত্রীর মৃত্যুর দিকে যদি দেখি তাহলে আমরা সহজেই অনুভব করতে পারব যে, তার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও মৃত্যু একইভাবে তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়েছে—

> *"সকলে যখন টের পাইল যাদবের সঙ্গে পাগল দিদিও পরলোকে চলিয়াছেন, যাদবের আগেই হয়তো তার শেষ নিশ্বাস পড়িবে, চারিদিকে নতুন করিয়া একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। ছেলে- বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ একেবারে যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। ...তারপর যাদবও আর সাড়াশব্দ দিল না। সকলে বলিল সমাধি। পাগলা দিদি মারা গেলেন ঘন্টাখানেক পরে, ঠিক সময়টি কেহ ধরিতে পারিল না। একটি ব্রাহ্মণ সধবা গঙ্গা জলে মুখের ফেনা মুছে দিলেন। যাদবের শেষ নিশ্বাস পড়িল গোধূলিবেলায়।"* [১০]

সত্য ও মিথ্যা এই দুই নিয়েই মানুষের জগৎ গড়ে উঠেছে। যাদবের মতো মানুষেরা মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে দ্বিধা বোধ করে না। মনের জোরে মৃত্যুকেও যে মানুষ জয় করতে পারে তা যাদবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়।দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে আমরা দুই দিনের অভিনেতা মাত্র, কেউ মিথ্যা অভিনয় করে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়, তো কেও সত্যের জন্য অভিনয় করে। যাদবের মতো মানুষেরা সেই মিথ্যার অভিনয় করেই মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পিছপা হয় না।

সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকেই অভিযোজন শুরু হয়েছে যা আজও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। সময় এবং পরিস্থিতি আমাদের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন চরিত্রের মানুষ গঠিত করে তোলে। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে একটি মানুষ প্রায় ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত বিপরীতমুখী হতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের

এমনই একটি চরিত্র হল মতি। মতিকে প্রথম জীবনে একটি সরল সাদা মেয়ে হিসেবে চিত্রিত করেছেন লেখক। কুমুদকে দেখার পর তার মনের পরিবর্তন হতে শুরু করে।তাই প্রথমে সে কলকাতায় আসে একমাত্র কুমুদকে থেকে খুঁজে পাবার আশায়। গ্রাম্য মূর্খ মেয়ে মতি, তালপুকুরে তার হারিয়ে যাওয়া মাকড়ি কিনে দিয়েছিল কুমুদ আর তারপর থেকেই সে রাজপুত্র প্রবীর অর্থাৎ কুমুদকে কাছে পেতে চেয়েছে। অবশেষে কুমুদকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার পর আর পাঁচটা মেয়ের মতো সে সুখে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। লেখকের কথায়—

> *"রাজপুত্র প্রবীরকে স্বামী হিসাবে পাইয়া মতির সুখের সীমা নাই। গ্রাম ছাড়িতে চোখে জল আসে, অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া রহস্যময় ভীতি বুক চাপিয়া ধরে, তবুও আহ্লাদে মেয়েটা মনে মনে যেন গুলিয়ে গেল। এইটুকু বয়সে এমন উপভোগ্য মন-কেমন-করা! স্টিমার ছাড়িলে জেটিতে দাঁড়ানো পড়ানকে ঘোমটার ফাঁকে দেখিতে দেখিতে ভিতরটা যখন তোলপাড় করিতে লাগিল আর চোখের জলে সব ঝাপসা হইয়া গেল, রাজপুত্র প্রবীর পাশে বসিয়া আছে অনুভব করার মধ্যেই তখন কী উত্তেজনা কি আশ্বাস!"* [১১]

কুমুদের ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে মতি ক্রমশ একাত্ম হতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে সে শহরের আদব-কায়দা বুঝে ওঠার চেষ্টা করে। হোটেলের ভাত খাওয়া প্রসঙ্গে মতির গ্রাম্য সরলতা আমাদের চোখে পড়ে-

> *"... ঘরে ভাত দিয়ে গেল। নিজের থালায় ভাত এর পরিমাণ দেখিয়া মতি বলিল, মাগো, কত ভাত দিয়েছে দ্যাখো আমাকে! আমার মতো সাতটার কুলিয়ে যাবে যে!*
> *মেসে হোটেলে এমনই দেয়।*
> *নষ্ট হবে তো? ডেকে বলো না তুলে নিয়ে যাক?*
> *হোক না নষ্ট, আমাদের কী?*
> *তবু মতির মন খুঁতখুঁত করতে লাগিল। আহা, ভাত যে লক্ষ্মী, ভাত কি নষ্ট করতে আছে! খাইতে খাইতে আবার সে আফসোস করিল। কুমুদ বলিল, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে দেখছি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে এতো ভাবছো? ভাত নষ্ট হবে তাও হোটেলের ভাত, এ আবার মানুষের মনে আসে?"* [১২]

কুমুদ মতির গলার হার বিক্রি করে থিয়েটার দেখতে যায়। প্রথম অবস্থায় মতির খারাপ লাগলেও ধীরে ধীরে সে কুমুদের ভবঘুরে জীবনকে আপন করে নেয়। তাই মতি অনুভব করে—

> *"...লুকাইয়া টাকা জমাবে না কচু! কী দরকার? টাকার জন্য কুমদের যে কোনো দিন আটকাইবে না, এখন হইতে মতির তাহাতে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। সাজ খুলিতে খুলিতে উত্তেজনায় মতির চোখ জ্বলজ্বল করে। সে বোধ করে একটা অভূতপূর্ব বেপরোয়া ভাব, কিসের হিসেব, ভাবনা কীসের? কে তোয়াক্কা রাখে কবে কীসে কী সুবিধা অসুবিধা হতে পারে? কি প্রভেদ গয়না থাকায় আর না থাকায়? কুমুদের যেন তুলনায় নাই, কুমুদের মতামতগুলিও তেমনি অতুলনীয়।স্ত্রীর সঙ্গে টাকা-পয়সা রীতিনীতি লইয়া ছিনিমিনি খেলার চেয়ে আর কিসে বেশি মজা? তারপর যা হয় হইবে। কুমুদের বুকে মতি ঝাঁপাইয়া পড়ে। আহ্লাদে গলিয়া গিয়ে বলে, ওগো শোন, নাচ- গান শেখাবে আমায়, আজ যেমন নাচছিল? ঘরে খিল দিয়ে তোমার সামনে নাচব?*
> *বলে, রোজ থেটার দেখিও, রোজ। বিকেল বিকেল বেঁধে রেখে চলে যাব, অ্যাঁ?*
> *বলে, বেচে দেবে তা দাও না, সব গয়না, বেঁচে দাও। ফুর্তি করি টাকাগুলো নিয়ে।"* [১৩]

এই মতি যেন অন্য এক মতি, গ্রাম্য জীবনযাপনের থেকে বেরিয়ে এখন সে ভবঘুরে জীবনের স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতে শিখেছে।

মতি ও কুমুদের উপকাহিনীর শেষে আমরা মতির সর্বোচ্চ পরিবর্তন লক্ষ্য করি, যা শশী ও পরানকেও অবাক করেছে।বিনোদিনী অপেরার ডাকে কুমুদকে অনেক দূরে যেতে হবে, সেইজন্য মতিকে কুমুদ তাদের গ্রামে থাকতে বলে, তাই শশী ও পরান স্টেশনে এসেছে মতিকে নিতে কিন্তু দেখা যায় মতি কুমুদের সঙ্গ ছাড়তে অস্বীকার করে এবং একটি সুকৌশল অবলম্বন করে কুমুদের সঙ্গে সারা জীবনের মতো বিদায় নেয় মতি। এই ঘটনা শশী ও পরানকে আশ্চর্য করে দেয়—

> *"মতির এই অস্বাভাবিক নির্লজ্জতায় শশী ও পরান স্তম্ভিত হয়ে যায় শশী যেন একটু রাগ করিয়া গাড়িতে নামে। প্রেম আসিয়াছে বলিয়া এত কি বাড়াবাড়ি অতটুকু মেয়ের। কুমুদ মৃদুস্বরে হাসিয়া বলে পাকা গিন্নির মত করলে যে মতি? কি কথা বলবে?*

বলছি দাঁড়াও - আসছি।

বলিয়া কুমুদকে পর্যন্ত স্তাম্ভিত করিয়া দিয়া মতি ল্যাবরেটরীতে ঢুকিয়া গেল। গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা পড়ল, গার্ড নিশান দেখাইল, প্ল্যাটফর্মের শশী ও পরান অস্থির হইয়া উঠিল- তবু মতি বাহির হইল না। গাড়ি ছাড়িলে গাড়ির সঙ্গে চলিতে চলিতে শশী বলিল, আমরা কি উঠবো নাকি কুমুদ পরের স্টপেজে ওকে নামিয়ে নেব?

কুমুদ বারণ করিয়া বলিল, না না দরকার নেই। আমি ব্যবস্থা করব শশী।" [১৪]

ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, পরিবর্তনই সংসরের নিয়ম, মানুষ পরিবর্তন ছাড়া বাঁচতে পারে না।ঔপন্যাসিক এই কথাটিই মতির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়েছেন।জীবনের রঙ্গমঞ্চে যদি আমরা কুমুদকে দেখি তাহলে সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে একটি আলাদা চরিত্র হিসেবে দেখতে পাবো। প্রথমত সে সারাজীবন ছন্নছাড়া জীবনকে বরণ করে নিয়েছে, প্রথমে একটা নাট্য দলের সঙ্গে কাজ করতো, পরে সে তা ছেড়ে দিয়ে নতুন একটি নাট্য দলের খোঁজ করে।এই ভাবে সে ভবঘুরে জীবনে অভ্যস্ত।এমনকি মতিকে বিয়ে করেও সে সংসারে স্থিরভাবে মনোনিবেশ করতে পারেনি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে সবসময় উদাসীন থেকেছে-

"তাহার দুর্ভাবনার পরিণাম দেখিয়া কুমুদের যেন মজা লাগিল।পাশে বসাইয়া বলিল, আমার বউ হয়ে তুমি তুচ্ছ টাকার জন্য ভাবছ মতি? আজ সাত টাকা আছে, আজ তো চলে যাক, কালের ভাবনা কাল ভাবব।ব্যবস্থা একটা কিছু হয়ে যাবেই মতি, টাকার জন্য কখনো মানুষের বেঁচে থাকা আটকায় না।" [১৫]

শুধু তাই নয় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে জীবন কাটাতে তার জুড়ি মেলা ভার।কুমুদ তার ভবঘুরে জীবনে মতিকে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য করে। উপন্যাসে দেখা যায় কুমুদ শশীর বন্ধু হলেও শশীর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ।শশীকে দেখা যায় সাধারন সংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে।কিন্তু কুমুদ ছল-চাতুরির মাধ্যমে জীবন আতিবাহিত করে। তাই তার (কুমুদের) অর্থের কোন অভাব হয়না, কারন জীবনকে সেই ভাবেই তৈরি করে নিয়েছে।তার এই পার্থিব অভিনয় নিতান্তই নিয়তির দ্বারা চালিত বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

কুমুদের পরে যাদের কথা মনে আসে তারা হল বনবিহারী ও তার স্ত্রী জয়া। বনবিহারী হল কুমুদের বন্ধু।সে চিত্রশিল্পী হিসেবে তার জীবনতরীকে বয়ে নিয়ে যায়। সাধারণত হাসিখুশি উদাসীন শিল্পী মনের মানুষ হিসেবে লেখক উপন্যাসে তাকে তুলে ধরেছেন। বনবিহারীর যে ছবিটি জয়ার ভালো লেগেছে সেটি হল—

"জয়ার মতোই ইষৎ স্থূলকায়া এক রমণী কঙ্কালসার এক শিশুকে মাটিতে ফেলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে এক পলাতক সুন্দর দেবশিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া আছে- ছবিখানা এই।" [১৬]

জয়াকে একজন সাধারন গৃহস্ত রমণী হিসেবে চিহ্নিত করলেও তার ভিতরে দুটি বিশেষ সত্তা লক্ষ্য করা যায়।প্রথমত প্রথম জীবনে কুমুদের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ফলে কুমুদকে সে নিজের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি, সেই আক্ষেপ তার গলায় দেখা যায়—

"জয়ার ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ো ভয় পায় মতি, হঠাৎ কি হইল জয়ার? কুমুদকে যারা বাঁধিতে পারে নাই জয়াও কি তাদের একজন নাকি? তা যদি হয় তবে তো বড় কষ্ট জয়ার মনে! তাকে লইয়া কোন্ বুদ্ধিতে কুমুদ এখানে জয়ার সঙ্গে একত্রে বাস করিতে আসিয়াছিল? জয়ার জন্য ক্রমে ক্রমে মতির মন মমতায় ভরিয়া যায়। হিংসার চেয়ে সমবেদনাই সে বোধ করে বেশি।" [১৭]

দ্বিতীয়ত কুমুদ ও মতির ভালোবাসা দেখে জয়া ভালোবাসা সম্পর্কে একটি নতুন দিক আবিষ্কার করে। ঔপন্যাসিকের কথায়—

"জয়া বলিল না তুমি ওকে ভালোবাসো ও-ও তোমাকে ভালোবাস। ক'দিন আগে হঠাৎ আমার সন্দেহটা হয়। আগে তো খেয়াল করি নি।তারপর ক'দিন তোমাদের লক্ষ্য করে আমি বুঝতে পেরেছি প্রেম সম্বন্ধে এতকাল আমার ধারণাই ভুল ছিল। আমি ওকে ভালোবাসি নি, ওর প্রতিভাকে ভালোবেসেছিলাম। কুমুদ, যেদিন এটা বুঝতে পারলাম সেইদিন কি দেখলাম জানো? ওর প্রতিভাও ভুয়ো- সব আমার কল্পনা।" [১৮]

আমরা ভালো অথবা মন্দ কোন একটি জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে সেখান থেকে সহজেই ফিরতে পারি না। অভ্যাসগুলো জীবনের সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিশিয়ে ফেলি। উপন্যাসে এমন একটি চরিত্র আমরা দেখি শশীর এক

বছরের ছোট বোন বিন্দুর মধ্যে। বিন্দুর স্বামী নন্দলাল নানা ভাবে তার উপর অত্যাচার চালাত। বিন্দুকে প্রায়দিনই বাইজির মতো নাচতে বাধ্য করত, এমনকি তাকে জোর করে মদ খাইয়েছিল নন্দলাল। স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে নন্দলালের সমস্ত অত্যাচার বিন্দু মুখ বুজে সহ্য করে।অত্যাচারের ফলে বিন্দুর শরীর ভেঙে পড়লেও নিজের দাদার কাছে তা লুকিয়ে রাখতে চায় বিন্দু।শশী জিজ্ঞাসা করে-'তোর অসুখ বিসুখ করেছে নাকি বিন্দু'? উত্তরে বিন্দু জানায়-'কিসের অসুখ বেশ আছি আমি'।পরবর্তীতে দেখা যায় বিন্দুকে শশী গ্রামে নিয়ে আসলে বিন্দু কোনমতেই সাধারণ জীবন মেনে নিতে পারছিল না, কারন সে বিলাসবহুল মদ্যপ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাইতো সে শশীর আলমারি থেকে মদ চুরি করে খেয়েছিল।এতে সমস্ত গ্রামের মানুষ নিন্দা করলেও বিন্দুর কাছে তা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক।তারপর দেখি বিন্দু তার স্বামী নন্দলালের কাছে গিয়ে যেন স্বস্তি ফিরে পায়। এইভাবে চলে জীবনের রঙ্গমঞ্চ, যা একজনের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলেও অন্য জনের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক।এখানে ভালো-খারাপ, দোষ-গুণ, ন্যায়-অন্যায় সম্পন্ন সব ধরনের মানুষই লক্ষ্য করা যায়।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আমরা বলতে পারি যে, শশী-কুসুম, মতি-কুমুদ, জয়া–বনবিহারী, ও বিন্দু-নন্দলাল প্রভৃতি সম্পর্কের মধ্যে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।।ফলে রঙ্গমঞ্চের বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়।এছাড়া হারু ঘোষের হঠাৎ মৃত্যু, যাদবের মৃত্যু ও গোপালের গৃহত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা যা নিয়তির পরিণতির প্রতি আমাদের ইঙ্গিত দেয়। শশী ও কুসুমের মধ্যে নিবিড় প্রেম থাকলেও তারা মিলিত হতে পারেনি, যদিও সামাজিক বাঁধা ছিল এর প্রধান কারণ, তবুও এটি যেন কোথাও নিয়তিরই করুণ পরিণতি। মতি-কুমুদ ও বিন্দু -নন্দলালের ক্ষেত্রে বলা যায় তাদের ভালোলাগা ধীরে ধীরে ভালবাসায় পরিণিত পায়।শেষে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে মতি অস্বীকার করে আর বিন্দু স্বাভাবিক জীবনে এসেও সেখানে টিকে থাকতে পারে না। অন্যদিকে জয়া ও বনবিহারীর সম্পর্কে ফাটল দেখা যায়, বনবিহারীর প্রতিভা পরবর্তীতে জয়ার অপছন্দ হয়।পাশাপাশি যাদবের মৃত্যু ও গোপালের সাজানো সংসার ছেড়ে কাশী যাওয়া সমস্তই যেন জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঘটে যাওয়া নিয়তির অনিবার্য ফল।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৫, পৃঃ ৪৫৭
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পুতুল নাচের ইতিকথা, সুন্দর প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৭, পৃঃ ১৪
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০০, পৃঃ ২৭৪
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পুতুল নাচের ইতিকথা, সুন্দর প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৭, পৃঃ ১৩৫
৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৮
৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯০
৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৩
৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৮
৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১
১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৮
১১. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪০
১২. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪১
১৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬০

১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৭
১৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫০
১৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৪
১৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৩
১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৬